প্রয়োজন সার্বভৌম খাদ্য ব্যবস্থা

লিখেছেন **সাইফুল হাসান**

জাহানারা, বয়স ৪৫। বাড়ি কক্সবাজার। লবণের জমিতে কাজ করেন। এক সময় জাহানারাদের নিজস্ব জমি ছিলো, গোলা ভরা ধান ছিলো, ঘরে শান্তি ছিলো। আর কিছু না থাকলেও খাবারের নিশ্চয়তা ছিলো। আগে তার চারপাশ ছিলো সবুজ আর সবুজ। আজ কোথাও শান্তি নেই। সবুজও নেই। ধানের জমি চলে গেছে লবণ আর চিংড়ি চাষীদের হাতে। এক সময় বিদেশী কোম্পানি এলো বাণিজ্য করতে। কৃষককে তারা বীজ দিলো। বললো প্রচুর ফলন হবে। তাদের দেয়া বীজ চাষ করলাম। প্রাকৃতিক সারের জায়গায় এলো রাসায়নিক সার, পোকা মারার জন্য নানা রকম বিষ। কৃষক না বুঝেই অতিরিক্ত লাভের আশায় বিদেশীদের বুদ্ধিমত চাষ শুরু করলো। কয়েক বছর পর দেখা গেলো বীজ আমাদের হাতে নেই। আবার নিজেদের যে বীজ ছিলো সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষতিকারক পোকামাকড় ধ্বংসের নামে বিষ দিয়ে সব পোকামাকড় মেরে ফেললাম। গাছ মরে গেলো। সবুজ ভূমি বিরান হতে থাকলো। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে ১০০ প্রকারের মধ্যে ৯০ জাতের পোকামাকড়ই ফসলের উপকার করে। ক্ষতিকারক ১০টি পোকা ধ্বংস করতে সব উজার করে দিলাম। বিদেশী কোম্পানির পরামর্শে ক্ষতি হলো কৃষকেরই। আজকে পানি এমন দূষিত যে তা আর কোনোভাবেই ব্যবহার উপযোগী নেই। আজকে কি উৎপাদন হবে আর কি খাবো তার নিয়ন্ত্রণও আমাদের হাতে নেই।

জাহানারা বাংলাদেশের একটি কৃষক পরিবারের প্রতিনিধি। অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রায় একই রকম কথা শোনা গেলো। এদেরই একজন গঙ্গা। নেপাল থেকে এসেছিলেন। তিনি জানালেন, নেপালের ৭৮ শতাংশ মহিলা খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। তারা প্রতিদিন ৮ থেকে ১০ ঘন্টা পরিশ্রম করে। খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে অধিকাংশ মহিলা জড়িত হলেও নেপালে সবার শেষে খাবার পায় মহিলা। আজকে বিদেশী বীজ, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে হচ্ছে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, কৃষিতে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো জড়িয়ে পড়ার ফলে খুব কম লোকেরই জমির ওপর অধিকার আছে। অর্থাৎ কৃষক তার জমি হারিয়েছে। কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি, হাইব্রিড বীজ আর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলা হলেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এতে কৃষকের ক্ষতি ছাড়া লাভ হচ্ছে না। আর কৃষির ওপর কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর হস্তক্ষেপ যত বাড়ছে ততই দেশে দেশে নারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

রুচি লোহনী, নেপালী তরুণী। আরআরএন নামে একটি সংস্থার সঙ্গে কাজ করেন। তিনিও নেপালে মহিলাদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'নেপালী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোয় নারীর প্রতি বৈষম্য প্রকট। সংবিধানেও নারীর বৈষম্য বিদ্যমান। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এ পর্যন্ত ৫০ হাজার লোক মারা গেছে। অনেক পরিবার ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে অন্যত্র চলে গেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারী ও শিশু। আজ আমরা যা কিছু নিয়েই কথা বলি না কেন, সব কিছুর সঙ্গে খাদ্যের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন জড়িত। বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে।'

mve‡fŠg Lv`¨ AwaKv‡ii `vwe‡Z XvKvq †`wk-we‡`kx‡`i i¨vjx

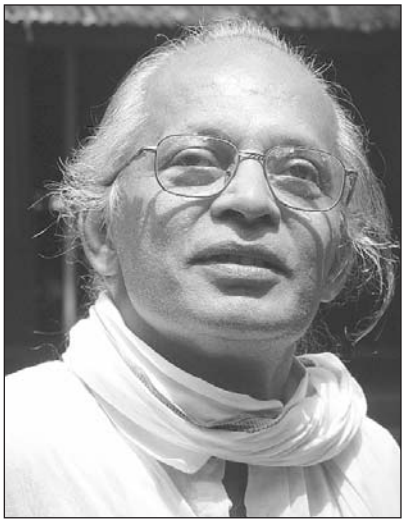

dinv` gRnvi, mve‡fŠg Lv`¨ Av‡›`vj‡bi †`kx ce³v

রুচির মত মঙ্গোলিয়া, ফিলিপাইন, জাম্বিয়া, হল্যান্ড, ভারত ও জাপানের প্রতিনিধিরা যার যার দেশের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। নবেম্বরের ২৫ তারিখ ঢাকার ওসমানী মিলনায়তনে এশিয়া প্যাসিফিক গবেষণা নেটওয়ার্কের (APRN) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সার্বভৌম খাদ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত পিপল্স কনভেনশন। কনভেনশনের স্থানীয় আয়োজক ছিলো উবিনীগ। ২৫-২৭ এই তিনদিনের কনভেনশনে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে ৩০টি সহ সারা বিশ্বের ৩৭টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। খাদ্যের সার্বভৌমত্ব বিষয়ক এ ধরনের কনভেনশন বিশ্বের মধ্যে এটাই প্রথম। এই কনভেনশনেই বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা তাদের এসব অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

খাদ্য নিরাপত্তা নয়, খাদ্যের সার্বভৌমত্ব

এই সম্মেলনে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচলিত

ধারণার বিপরীতে খাদ্য সার্বভৌমত্ব কিংবা সার্বভৌম খাদ্য ব্যবস্থায় কথা বলা হয়। ১৯৯৬ সালে রোমে অনুষ্ঠিত খাদ্য সম্মেলনে প্রথমবারের মত খাদ্য নিরাপত্তার বদলে খাদ্যের সার্বভৌমত্বের দাবি ওঠে। কারণ হিসেবে বলা হয়, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO) তাদের প্রতিবেদনে দাবি করে প্রয়োজনের তুলনায় বিশ্বব্যাপী অনেক বেশি খাদ্য উৎপাদিত হয়। তারপরও বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মানুষ অর্ধভুক্ত বা অভুক্ত থাকে। খাদ্য নিরাপত্তা হলো, রাষ্ট্র তার জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্র খাদ্য নিরাপত্তার কথা বলে কৃষকের উৎপাদিত খাদ্যের পরিবর্তে কোম্পানি উৎপাদিত খাদ্য আমদানি করতে চায়। ফলে কৃষক নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে। তাই বিভিন্ন দেশের জনগণের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে প্রতি দেশে নিজ নিজ অবস্থার প্রেক্ষিতে কৃষক এবং খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী তাদের খাদ্য উৎপাদন ও ভোগ করবে। যারা খাদ্য উৎপাদন করেন না খাদ্য সার্বভৌমত্বের ধারণায় তাদের সঙ্গে উৎপাদকের সম্পর্ক রচনা করে। খাদ্যের সার্বভৌমত্ব হলো জনগণ কি খাবে বা খাবে না, সে কি উৎপাদন করবে তা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। এখানে রাষ্ট্র বা অন্য কেউ নাক গলাতে পারবে না। খাদ্য মানুষের অধিকার, সেই সঙ্গে সংস্কৃতিরও অংশ বটে। সুতরাং জনগণ তার নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ করবে। রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে সেই কাজে সহায়তা করা।

খাদ্য নিরাপত্তা হলেই যে জনগণকে খাবারের নিশ্চয়তা দিতে পারে না তার একটি ভালো উদাহরণ হলো উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা। কয়েক বছর ধরে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা হচ্ছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে উত্তরাঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ মঙ্গার শিকার হচ্ছে কেন? অর্থাৎ দেশে খাবার আছে কিন্তু সেটা জনগণের নাগালে নেই। উত্তরাঞ্চলের কৃষকরা বছরে দুই মৌসুম ধান চাষ করে। ভূস্বামীদের গোলা কৃষকদের ধানে ভরে গেলেও কৃষক ক্ষুধার্ত থাকে। কৃষকদের উৎপাদিত খাদ্য জমে গোডাউনে। কিন্তু কার্তিকে দেশের বৃহত্তম একটি জনগোষ্ঠী ক্ষুধায় কষ্ট করে। সুতরাং শুধু খাদ্য থাকলেই মানুষ খাবার পাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। খাদ্যের সার্বভৌমত্বের সার কথা এখানেই। সার্বভৌম খাদ্য, খাদ্যের বাণিজ্যিকীকরণ বা আন্তর্জাতিকীকরণ নয় স্থানীয় বাজারের কথা বলে।

নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্যের সার্বভৌমত্ব একই সুতোয় গাঁথা

নারীর ক্ষমতায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যু। নারীর ক্ষমতায়নকে কেন্দ্র করে অনেক কাজ দেশে হচ্ছে। সামাজিক ও

c¨vU gvb, chv³ we‡kÁ, KvbvWv

†i‡b †f‡j, c¨v‡U›U AvBb we‡kÁ

রাজনৈতিক কাঠামোয় নারীর ক্ষমতায়ন দেশের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত। নারীকে বাদ দিয়ে সমাজ বা রাষ্ট্র নয়। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। সুতরাং তাদের উন্নয়নের ইস্যুকে বাদ দিয়ে কোনো উন্নয়নই সম্ভব নয়। ঠিক একথাটিই বললেন কনভেনশনে আগত বিশেষজ্ঞরা। তাদের গবেষণার মাধ্যমে তারা দেখান সার্বভৌম খাদ্যের নিশ্চয়তা আর নারীর ক্ষমতায়ন এক সুতোয় গাঁথা। কৃষির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক হাজার বছরের। এই সম্পর্ক ক্লাসে বই পড়ে মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং উত্তরাধিকার সূত্রে মা তার মেয়েকে, মেয়ে তার মেয়েকে প্রাত্যহিক জীবন চর্চার মধ্য দিয়ে এই জ্ঞান বিতরণ করে। যে কারণে নয়া কৃষি আন্দোলনের প্রবক্তা ফরহাদ মজহার এ দেশের প্রতিটি গ্রামীণ নারীকে একটি বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরি বলে মনে করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, খাদ্যের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়নের সম্পর্ক কোথায়?

কিছুদিন আগে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ প্রতিবেদন হিসেবে ফরহাদ মজহারকে আনা হয়েছিলো। দেশের কৃষি, কৃষক, ফসল, ফসলের উৎপাদনসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছিলেন। তার একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'গ্রামীণ প্রতিটি নারী এক একটি ল্যাবরেটরি। কারণ পশ্চিমা দেশগুলো মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে গবেষণা চালায় বীজের অঙ্কুরোদগম হবে কি না জানার জন্য? আমার দেশের মেয়েরা দাঁতের তলায় একটি ধান রেখে 'কুট' করে কামড় দিয়ে বলতে পারে বীজের অঙ্কুরোদগম হবে কি না? যে কাজের জন্য কর্পোরেট বিশ্ব অর্থ খরচ করে, সময় অপচয় করে, একই জিনিস আমাদের মেয়েরা মিনিটের মধ্যে বলতে পারে। এবং মেয়েটা যেটি বলবে বীজের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সেটিই ঘটবে।'-এই জিনিসটা তাকে গবেষণা করে শিখতে হয়নি। শিখেছে উত্তরাধিকার সূত্রে। বীজের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক, সন্তানের সঙ্গে মায়ের সম্পর্কের মতই।

গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে যারা জানেন তারা ব্যাপারটি ভালো বুঝবেন। মাঠে ধান/গম রোপণ থেকে শুরু করে কেটে বাড়ি আনা পর্যন্ত প্রায় সব কাজ সাধারণত পুরুষরাই করে। কোনো কোনো অঞ্চলে পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে নারীরাও অবশ্য জড়িত। ধান কাটার পর থেকে ধান মাড়াই, বাছাই, সংরক্ষণসহ সব কাজ নারীর। মূলত এই কাজে নারীরাই বিশেষজ্ঞ। ধান ঘরে আসার পরে নারী প্রথমেই বীজের জন্য ধান আলাদা করে। তারপর একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় সে এই বীজ সংরক্ষণ করে পরবর্তী মৌসুমি ফসল উৎপাদনের জন্য। এরপর ফসল হতে খাদ্য উৎপাদন, বন্টন থেকে ভোগ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী থাকে কেন্দ্রে। মূল কথা, এখন পর্যন্ত গ্রামীণ এমনকি শহরেও খাদ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছে নারী। নারী যখন খাদ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকে তখন পরিবারের ক্ষমতাবলয়েও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। কৃষিতে কর্পোরাইজেশন বা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা যত বাড়ছে নারীর কাজ তত কমে যাচ্ছে। নারীর হাত থেকে বীজ নিয়ে নেবার ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তার আর কোনো অংশগ্রহণ থাকছে না। এভাবে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ করায় নারী ঘরে কর্মহীন হয়ে পড়ছে। তার ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে বিশ্বায়নের দালাল। কর্মহীন নারীর গুরুত্ব কমছে কৃষিতে। নারী ঢেঁকিতে চাল মাড়াই করে আটা বানিয়ে তবে পিঠা বানায়। সে পিঠার কি স্বাদ তা এদেশের সব মানুষের জানার কথা। সময়ের পরিক্রমায় বিশ্বায়নের প্রবক্তারা মানুষের জিভের স্বাদও কেড়ে নিচ্ছে। নারী যখন ঘরে কাজ হারাচ্ছে তখন তার স্থানান্তর (মাইগ্রেশন) ঘটছে। যার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো গার্মেন্টসের ২০ লাখ নারী। এই নারীরা গ্রামীণ কাঠামোয় কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো এক

সময়। কিন্তু কৃষিতে নিয়ন্ত্রণ হারানোয় তারা শহরমুখী হয়েছে। গার্মেন্টসে যারা কাজ পেয়েছে তারা তো সৌভাগ্যবতী। কিন্তু এমন অনেক নারীর কথা জানা যায় স্থানান্তরের ফলে যাদের স্থান হয়েছে পতিতালয়ে, বা বিক্রি হয়ে গেছে পার্শ্ববর্তী দেশে। পাকিস্তানের আজরা তালাত সাঈদ তার প্রবন্ধে একথাই বললেন। তিনি বলেন, 'কৃষি থেকে নারীর ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে তারা যেমন কাজের জন্য এক জেলা থেকে অন্য জেলায় চলে যাচ্ছে আবার পাচারের শিকারও হচ্ছে।'

ওপরে একটি উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় নারী এবং খাদ্যের মধ্যে সম্পর্ক কোথায়। খাদ্য ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র থেকে নারীদের সরিয়ে দিচ্ছে ধ্বংসাত্মক কৃষিনীতি। নেপালের এনজিওকর্মী রুচি লোহানী বলেন, 'নারীকে কৌশলে কৃষি বা খাদ্য ব্যবস্থাপনা থেকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে কারণ এসব বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে আমাদের কৃষি, আমাদের জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও জীবন ধ্বংস করতে চায় তাদের স্বার্থে। নারী বীজ ব্যবস্থাপনা থেকে সরে গেলে নিজদের উন্নত বীজ আর আমরা সংরক্ষণ করতে পারবো না। হাজার হাজার উন্নত জাতের বীজ হারিয়ে যাবে চিরতরে। যাতে তারা তাদের বীজ ও কীটনাশক আমাদের কাছে বিক্রি করতে পারে এবং মুনাফা লাভ করতে পারে। এই কাজটি নারীকে সরিয়ে দেয়া ছাড়া সম্ভব নয়।'

প্রশ্ন-উত্তর দুটোই রাজনৈতিক

খাদ্যের সার্বভৌম প্রশ্নটি যেমন জনগণের মৌলিক অধিকার, তেমনি রাজনৈতিকও। অধিক উৎপাদনের স্লোগান দিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় কীটনাশক বা হাইব্রিডকে উৎসাহিত করছে। এতে কৃষক কতটা লাভবান হচ্ছে সেসব বিষয়ে সরকারের কোনো গবেষণা নেই। এর সম্ভাব্য ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কেও সরকার সচেতন নয়। ফলে তারা কিছু না জেনে বুঝেই বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হাতে দেশের কৃষিকে তুলে দিচ্ছে। যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে দেশের জনগণকে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হাতে কৃষি ব্যবস্থা লিজ দেবার ফলে কৃষি ব্যয়বহুল এবং ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে প্যাটেন্ট আইনের ফলে সারা বিশ্বের খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন কোম্পানির নিজস্ব তালিকায় চলে যাচ্ছে। খাদ্যের সার্বভৌমত্বের কথা যখন ওঠে তখন জমির পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নটিও সামনে আসে। দেশের অধিকাংশ জমি এখন কৃষকদের হাতের নাগালের বাইরে। ফলে কৃষকের খাদ্যের ব্যাপারটি এখন আর তাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। জমির পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারটিও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। ভারত থেকে আগত পিভি সতীশ বলেন, 'খাদ্যের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে অবশ্যই

AwRR †Pšaix, wewb‡qvM we‡kIÁ, wbDwRj¨vÛ

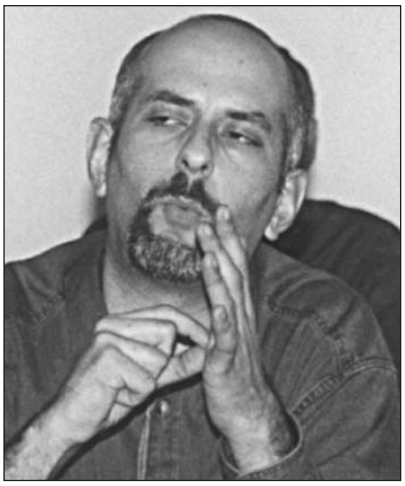

রাজনৈতিক ব্যাপার জড়িত। তার আগে আপনার কৃষককে তো এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে।' মালয়েশিয়ার সরোজীনি ভি রেঙ্গম বলেন, 'বহুজাতিক কোম্পানিগুলো আজ বিশ্বের অনেক জায়গায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা তার আগ্রাসী বাণিজ্যনীতির কারণে বারবার বিশ্বের কৃষক/শ্রমিক সাধারণ মানুষ তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলো দারিদ্র্য কমাতে গিয়ে দারিদ্র্যকে বরং পুনঃউৎপাদন করছে। খাদ্যের সার্বভৌমত্ব বা জনগণের অধিকার যাই বলেন না কেন সবকিছুই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে হলেও জনগণের কাছে ফিরে যেতে হবে। আপাতত এছাড়া আর কোনো বিকল্প আমাদের হাতে নেই। জনগণকে যদি বোঝানো সম্ভব হয় তবেই তারা নিজেদের অধিকারের পক্ষে দাঁড়াবে।' পিভি সতীশ বলেন, 'কৃষক কিন্তু সব সময় পরিবেশ বান্ধব চাষাবাদের পক্ষে। কিন্তু মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো তা চায় না।'

আগ্রাসী বাণিজ্যনীতির কারণে সারা বিশ্বের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ মাত্র ১০টি কোম্পানির হাতে চলে যাচ্ছে। এসব কোম্পানির প্রধান পৃষ্ঠপোষক আমেরিকা-ইউরোপের ধনী দেশগুলো। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত তাদের ওপর আমাদের যে নির্ভরশীলতা বাড়ছে তা এক সময় পুরোটাই পরনির্ভরশীলতায় পরিণত হবে। এতে জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সবই বিপন্ন হবে।

আমেরিকা-ইউরোপসহ ধনী দেশগুলো তাদের কৃষিতে প্রচুর ভর্তুকি দেয়। কিন্তু আফ্রিকা বা অনুন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষির ভর্তুকির ব্যাপারে উন্নত দেশগুলোর তীব্র আপত্তি। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে তারা এ ব্যাপারে চাপ অব্যাহত রেখেছে। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলো আমেরিকা বা ইউরোপের কৃষিতে ভর্তুকি কমানোর কথা বারবার বললেও কাজ হয়নি। আমেরিকা প্রতি বছর হাজার হাজার টন গম সমুদ্রে ফেলে দেয়। কিন্তু বিশ্বের দরিদ্র জনগণকে খেতে দেয় না। রাজনীতিবিদদের দুর্বল নৈতিকতা, দেশপ্রেমের অভাবে জনগণের প্রতি জবাবদিহিতার অভাব, সর্বোপরি পরনির্ভরতার সুযোগ নিয়ে মুনাফালোভী কোম্পানিগুলো জনগণের জীবনের ওপর চেপে বসছে। কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আসছে তাদের পৃষ্ঠপোষক দেশগুলো। যাতে শোষণ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। আর এই শোষণের সহযোগীর ভূমিকা পালন করছে স্থানীয় সরকার। বিদেশী কোম্পানিগুলো সরকারকে ব্যবহার করছে তার দেশের জনগণের বিরুদ্ধেই।

দেশে বাজেট হয়। বাজেটে অঙ্কের পরিমাণ প্রতিবছর বাড়ছেই। কিন্তু যে কৃষক আর কৃষি দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের জন্য

m‡ivwRwb wf †i½g, gvj‡qwkqv

বাজেটে তেমন কোনো বরাদ্দ নেই। দেশের মোট জনসংখ্যার পয়েন্ট এক ভাগেরও কম সেনাবাহিনীর জন্য প্রতি বছর বাজেটে যে পরিমাণ বরাদ্দ থাকে তার দশ ভাগের এক ভাগ কৃষির জন্য বরাদ্দ থাকে না। অর্থাৎ সরকারও চায় না দেশের কৃষির উন্নতি। দেশের কৃষিকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হাতে তুলে দিয়েই তারা খুশি। এমন অবস্থায় সার্বভৌম খাদ্যের ব্যাপারটি সত্যিই গুরুতর রাজনৈতিক প্রশ্ন। রাজনীতিকরা জনগণের কল্যাণে পরিচালিত না হলে সার্বভৌম খাদ্যের দাবির পথে এগিয়ে যাওয়া দুরূহ। কানাডিয়ান বিশেষজ্ঞ প্যাটমুনি একই কথা বলেন। তিনি বলেন, 'রাজনীতিকে আমরা বাদ দিচ্ছি না। কিন্তু এ বিষয়ে আপাতত কোনো সমাধান আমাদের হাতে নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার এসব বিষয়ে সচেতন

হচ্ছে এটা আশার কথা। যদিও তার পরিমাণ কম। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা সার্বভৌম খাদ্যের যে আন্দোলন তার একটি নেটওয়ার্ক তৈরি প্রক্রিয়া আমরা শুরু করতে পেরেছি। বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেবো। বিশ্বের সব দেশের কৃষক তাদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে নেবে। তাদের সার্বভৌম খাদ্য আন্দোলনের দিকে নিয়ে আসাই আমি প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি।' সুতরাং জনগণের লোকায়ত জ্ঞানকে সামাজিকভাবে এগিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিবিদদেরও এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করাটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব হয়ে দেখা দিয়েছে।

জনগণের সার্বভৌম খাদ্য ব্যবস্থার ঘোষণা এবং বাংলাদেশ

অধিক খাদ্য উৎপাদনের নামে আজ রাষ্ট্রগুলো হাত মেলাচ্ছে শোষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সব শক্তি ও অধিক মুনাফালোভী কর্পোরেশনের সঙ্গে। তাদের প্ররোচনায় পরিবেশ ও প্রতিবেশে প্রাণনাশক, পরিবেশ-বিনাশী রাসায়নিক পদার্থ এবং জেনেটিক প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি জিএমও পণ্য ছড়াচ্ছে। খাদ্য উৎপাদক জনগোষ্ঠী এভাবে হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধ লোকায়িত জ্ঞানকে অস্বীকার করে। আমরা যখন কোম্পানিগুলোর চাপিয়ে দেয়া জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জিএমও'র মতো ক্ষতিকর প্রযুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। তখন তারা জিন থেকে চলে যাচ্ছে অণু'র পর্যায়ে অর্থাৎ ন্যানো টেকনোলজিতে। এতে জীবন ও জীবিকা আগের চেয়েও বেশি বিপদের সম্মুখীন। এতে খাদ্য ব্যবস্থা ও উৎপাদনের ওপর বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়ছে।

৩৭টি দেশের প্রতিনিধিরা কনভেনশনের খসড়া ঘোষণায় উপরোক্ত সাবধান বাণী শোনান। কিন্তু বাংলাদেশ কি এ বিষয়ে সচেতন? উত্তর হলো- না। এত বড় একটি কনভেনশন হলো। বিশ্বের বড় বড় সব গবেষকরা প্রবন্ধ উপস্থাপন করলো কিন্তু সেখানে সরকারের কোনো প্রতিনিধি ছিলো না। দেশের প্রতিটি থানায় একটি করে কৃষি অফিস আছে। মূলত এই অফিসগুলোর মধ্য দিয়ে সরকার তার বিদেশী বন্ধুদের স্বার্থরক্ষা করে। কোন জমিতে কি কীটনাশক, কত পরিমাণ, কি সার ব্যবহার করা দরকার এর প্রেসক্রিপশন এসব কৃষি অফিসারদের মধ্য দিয়ে কৃষকদের কাছে পৌঁছায়। নিরক্ষর কৃষককে এরা যা জ্ঞান দেয় অধিকাংশই তা-ই গ্রহণ করে। এর বাইরেও কিছু কিছু কৃষক যে স্বতন্ত্রভাবে কৃষি করার চেষ্টা করে না তা নয়। তবে তাদের সংখ্যা কম। ঝিনাইদহ ও ময়মনসিংহে এমন কৃষক আমরা দেখেছি, যারা দেশীয় প্রজাতি ও নিজস্ব পদ্ধতির সারের ওপর নির্ভর করে চাষ

W. AvRiv ZvjvZ mvC`, cwwK¯vb

করছে এবং ফলন পাচ্ছে অনেক বেশি। এ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি রিপোর্ট সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে কৃষকসহ কৃষিকে রক্ষা করার কোনো খাদ্য বা কৃষিনীতি হয়নি। বরং আমাদের কৃষিনীতি, খাদ্যনীতি অনেক বেশি বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ নির্ভর। যার ফলে এক দশককে ধনী-গরিবের বৈষম্য আরও প্রকট হয়েছে। শোষণের মাত্রা হয়েছে তীব্র। মানুষ প্রতিদিনই আরও বেশি দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। সব দেশেই মোটামুটি কর্পোরেটদের একই অবস্থা। তারা তাদের শোষণ ও বিশ্বের ওপর কর্তৃত্বকরণের লক্ষ্যে জীবনের জন্য যা কিছু প্রাকৃতিক সেগুলোকেও বাণিজ্যিকীকরণ করছে বা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ জন্যই বিশ্বব্যাপী শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে কৃষক, জেলে, কৃষি ও কারখানার শ্রমিক, নারী, আদিবাসী ও পশুপালক জনগোষ্ঠী আজ তাদের নিজ নিজ সমাজকেই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা ও নীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য সার্বভৌম খাদ্য ব্যবস্থার দাবি তুলছে। জনগণের প্রতিরোধ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা, বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কাঠামোগত সংস্কার বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সরাসরি ঠেকানোর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। একই সঙ্গে হাজার বছরের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও প্রাণবৈচিত্র্য ভিত্তিক পরিবেশসম্মত কৃষি ব্যবস্থার চর্চা ও প্রসারের মধ্য দিয়ে আমরা প্রমাণ করছি সার্বভৌম খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করার প্রযুক্তি জনগণের হাতে।

যখন কীটনাশক ছিলো না, ছিলো না রাসায়নিক সার তখনও মানুষের গোলা ভরা ধান ছিলো, পুকুর ভরা ধান ছিলো, জাহানারা, গঙ্গাদের জীবন শান্তির ছিলো। অনেকে যুক্তি দেবেন তখন লোক ছিলো কম। তাদের জানা উচিত তখন কৃষি জমি এবং উৎপাদনও কম ছিলো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জমি যেমন বেড়েছে তেমনি উৎপাদনও বেড়েছে। কিন্তু পুকুর, নদী উজার হয়ে গেছে। মাছে ভাতে বাঙালি এখন শুধু ভাত হলেই চালিয়ে নিতে পারে। মাছের সঙ্গে কত প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংস করেছি তার কোনো গবেষণা নেই। শুধু স্থানীয় জাতের জায়গায় বিদেশী বীজ এসেছে, লাঙ্গলের জায়গায় ট্রাক্টরের ফলে মোটা কাপড়, মোটা ভাতের স্লোগান যেমন গ্রামীণ জীবন থেকে হারিয়ে গেছে, তেমনি চাষাবাদের গবাদিপশুও শেষ। পানির স্তরে স্তরে এখন বিষ। গরুর মাংস এখন সাধারণ মানুষের কাছে দুষ্প্রাপ্য। তাও আবার ভারতীয় গরুর ওপর নির্ভরতা। সবমিলিয়ে বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষিকেন্দ্রিক সব কিছুই এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এই ব্যাপারটা কক্সবাজারের জাহানারা কিংবা নড়াইলে লক্ষ্মীরানী যতোটা বোঝে সরকার ততোটা নয়। লক্ষ্মীরানীরা জীবন দিয়ে শেখে ও জানে কিভাবে তার কৃষি শেষ হচ্ছে। সরকার বোঝে বহুজাতিক কোম্পানি বা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার প্রেসক্রিপশনে। মূল সমস্যা এখানেই। এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রেখেই কনভেনশনে আগত কৃষক শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞরা

i"wP †jvnvbx, GbwRI Kgx, †bcvj

ঘোষণা দেন- 'জনগণ, জাতিগোষ্ঠী এবং দেশের মানুষ তাদের নিজ পরিবেশ ও সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেবে, তারা কি খাদ্য উৎপাদন করবে এবং কিভাবে করবে? মাত্র গুটিকয় বহুজাতিক কোম্পানি দ্বারা খাদ্য উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে খাদ্য উৎপাদনের ওপর জনগণের অধিকার থাকবে। ফলে তারা নিরাপদ এবং নিজ সংস্কৃতির উপযোগী খাদ্য উৎপাদনও ভোগ করবে।'

নিজেদের কৃষি, প্রাণবৈচিত্র্য নিজেরা রক্ষা করবো না বহুজাতিক কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেবো- জাতীয় জীবনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হলে কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসীসহ সব জনগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। কারণ এই আন্দোলনের বিপক্ষে দাঁড়াবে রাষ্ট্র নিজে। জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই সার্বভৌম খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। নতুবা নয়।